# কৃষি প্রসঙ্গ

বিশেষ সংখ্যা - ১ জুলাই ২০১৩

আর্থিক সহযোগিতায় : নাবার্ড

প্রকল্প রূপায়ণে : DRCSC

**সম্পাদকীয়**

**ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের তিনটি মূল সমস্যাকে লক্ষ্য রেখে বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে নদীয়া জেলায় এক কৃষি প্রশিক্ষণ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ২০টি ফার্মার্স ক্লাবের সক্রিয় সদস্যকে। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার নামে এক স্বেচ্ছাসেবী ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণে দক্ষ সংস্থাকে। এই ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রগুলি হল- ১। কৃষি প্রযুক্তির প্রসার, ২। কৃষক ও আর্থিক সংস্থার মধ্যে মেলবন্ধন ও ৩। কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা অনুধাবন ও এক কার্যকরী সমাধনের চেষ্টা।**

**প্রশিক্ষণের প্রথমধাপে একবছর ধরে কুড়িজন কৃষক প্রশিক্ষণ পাবে। এই প্রশিক্ষিত কৃষক (মাস্টার ফার্মার্স)-রা প্রত্যেকে আরো কুড়িজন স্থানীয় কৃষককে উদ্বুদ্ধ করবে তাদের মতো করে, উন্নত চাষে।**

**এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ একদিকে যেমন ক্ষুদ্রচাষের সমস্যাগুলি সমাধানের রাস্তা দেখাবে, অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য খুবই জরুরি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী তৈরি করবে প্রত্যেক গ্রামে। প্রকল্পের প্রথমপর্ব শেষ হওয়ার সাথে যেসব দিক আমাদের উৎসাহিত করল, তার বিবরণ নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল। আমি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার-কে এই প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ জানাই।**

**শ্রী চঞ্চল মিত্র, সহায়ক মহা প্রবন্ধক-নাবার্ড, নদীয়া**

## নাবার্ডের ফার্মার্স ক্লাব প্রকল্প কিছু তথ্য

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল কৃষি। কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৬৫ শতাংশ মানুষ। জাতীয় আয়ের ১৮ শতাংশ কৃষি থেকেই আসে। একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এবং জাতীয় কৃষিনীতি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধিই পেয়েছে। যা নাকি গত পঞ্চাশ বছরে গড়ে ২ শতাংশ ছিল। নব্বই দশকের গোড়া-থেকেই সবুজ বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের অবনতি ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা মোটেই সুখকর নয়। ফলে কৃষির আরো উন্নয়নের কথা ভাবতেই হবে। এর জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের সূচনা, উন্নত প্রযুক্তির হস্তান্তর, উন্নত উপাদানের ব্যবহার, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সহায়ক অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দরকার হল, কৃষিক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, জ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তি, কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি। তাই প্রয়োজন কৃষকের হাতে কৃষিকাজের নতুন আবিষ্কার পৌঁছে দেওয়া ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক স্থাপনে অনুপ্রাণিত করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নাবার্ড ফার্মার্স ক্লাব গঠনের পরিকল্পনা করেছে।

১৯৮২ নাবার্ডের জন্ম লগ্নে তৈরি বিকাশ ভলানটিয়ার্স বাহিনী (ভিভিভি) ২০০৫ সালে ফার্মার্স ক্লাব নামে আত্মপ্রকাশ করে।

### ফার্মার্স ক্লাব কি

ফার্মার্স ক্লাব হচ্ছে একটি গ্রাম স্তরের সংগঠন যার সরকারিভাবে রেজিস্টেশন বা পঞ্জীকরণের প্রয়োজন নেই। এই ক্লাব নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখার মাধ্যমে গঠিত হয়। এনজিও বা কৃষি বিকাশ কেন্দ্র (কেভিকে)-এর মাধ্যমেও গঠিত হতে পারে।

### ফার্মার্স ক্লাবের প্রধান কাজ

- ক্লাবের সদস্যদের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সংস্থান সুনিশ্চিত করা এবং ব্যাঙ্ক ও ঋণগৃহীতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।
- প্রতিমাসে অবশ্যই মিটিং এর আয়োজন করা। প্রয়োজনে ক্লাব সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকেও মিটিং-এ যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করা।
- প্রযুক্তির মান উন্নয়নের জন্য, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, কৃষি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন দফতর এবং অন্যান্য সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা। অতিথি বক্তা হিসেবে গ্রামের অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সদস্য নয় এমন লোকেদেরও সভায় আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- সদস্যদের সুবিধার্থে চাষের সরঞ্জামের উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সদস্যদের পাইকারি দরে কৃষি সরঞ্জাম বিক্রি করা।
- সদস্যদের সুবিধার্থে যৌথ উদ্যোগে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ সুব্যবহারের জন্য সচেতন করা।

### ফার্মার্স ক্লাবের খুঁটিনাটি

**লক্ষ্য :** ঋণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি,

সচেতনতা এবং গ্রামবাসীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন।

**গঠন :** যে কোন ব্যাঙ্কের শাখা বা এনজিও-কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে।

**সদস্য :** ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি ছাড়া সমস্ত গ্রামবাসী।

**সদস্য সংখ্যা :** ন্যূনতম ১০ জন, ঊর্ধ্ব সীমা নেই।

**নেতৃত্ব :** ২ জন (মুখ্য কো-অর্ডিনেটর এবং সহ কো-অর্ডিনেটর) দক্ষ ও প্রগতিশীল কৃষক যারা নিয়মিত ব্যাঙ্ক ঋণ নেন ও পরিশোধ করেন।

**কার্যক্ষেত্র :** এক বা একাধিক গ্রাম।

**রেজিস্ট্রেশন :** আবশ্যক নয়।

**গঠনকারী ব্যাঙ্ক থেকে সহায়তা :** চতুর্থ ও পঞ্চম বছর।

**আর্থিক সহায়তা ক্লাবের স্থায়িত্ব:** সভ্যপদের চাঁদা (সভ্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)

- মাসিক সঞ্চয় (সভ্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী/যুগ্ম ঋণদান গোষ্ঠী গঠন ও পরিষেবা (নাবার্ড থেকে অনুদান)
- বিমা করার জন্য কমিশন (বিমা কোম্পানির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)
- ব্যাঙ্কের ব্যবসায় সহায়তার জন্য কমিশন (ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)

**ফার্মার্স ক্লাবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ**

- প্রশিক্ষণ ও চাষ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন (এবং সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কর্মশালায় আমন্ত্রণ)
- কৃষি মেলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা।
- পারস্পরিক সাহায্য (সরকারি দফতরের সহযোগিতায় বীজ ও সার সরবরাহ, স্বনির্ভর দল গঠন, যুগ্ম ঋণদান গোষ্ঠী গঠন, সমবায় স্থাপন)।
- পরিকাঠামো এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।
- ব্যাঙ্কের ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করা।
- বিশেষজ্ঞদের সাথে সাক্ষাৎকার কর্মসূচি

**আরও জানতে যোগাযোগ করুন**

১। রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়,কলকাতা
'অভিলাষা' ৬, রয়েড স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০১৬
দূরভাষ : ০৩৩ ২২৫৫২৩৮২/২২৫৫
ইমেল : nabardkol@dataone.in
ওয়েবসাইট : www.nabard.org

২। ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৪২,
দূরভাষ : ০৩৩ ২৪৪২৭৩১১
ইমেল : drcsc.ind@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.drcsc..org

## কেস স্টাডি

### যৌথভাবে চাষের ইতিবৃত্ত

নদীয়ার দত্তফুলিয়া ফার্মার্স ক্লাব, তিন বছর হল নাবার্ড কর্তৃক অনুমোদন মিলেছে। সদস্য সংখ্যা ২০ জন, যাদের সকলেরই প্রধান জীবিকা চাষবাস।

২০১২ এপ্রিল নাগাদ সঞ্চালক রেজাউল মণ্ডলের সঙ্গে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি)-এর ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষের আলাপ হয়। এই সূত্র ধরেই, ২০১২ সালের খরিফ মরশুমে জৈব পদ্ধতিতে গোবিন্দভোগ চাষ করার সুযোগ আসে এই দলের কাছে। জৈব পদ্ধতিতে গোবিন্দভোগ চাষ, বিসিকেভি-এর জৈব ধান চাষ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। রেজাউল মণ্ডল তার সহযোগীদের নিয়ে জরুরি মিটিং ডাকেন এবং ঠিক হয় দত্তফুলিয়া ফার্মার্স ক্লাবের ১০ জন চাষি যাদের জমি একই মাঠে পাশাপাশি রয়েছে তাঁরাই এই চাষে যুক্ত থাকবেন, বাকি সদস্যরা পর্যবেক্ষকের কাজ করবেন।

এভাবেই ১০ বিঘা জমি নির্দিষ্ট করা হয় চাষের জন্য। প্রয়োজনীয় বীজের যোগান দিয়েছিল বিসিকেভি। কারিগরি সহায়তাও মিলেছিল তাদের থেকেই। জমির মাটি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি ২০ কেজি সরষের খোল ব্যবহার করা হয়েছিল। আর প্রায় ৬ টনের মতো গোবরসার ব্যবহার করা হয়েছিল এই ১০ বিঘা জমিতে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১০ দিন মেয়াদের ১০ কেজি বীজধান পাওয়া গিয়েছিল। এই বীজে -১০ শতক জমিতে বীজতলা করা হয়। মূল জমি তৈরি করতে দেরি হওয়ায়, ১৫ দিনের চারা রোপণ হয়েছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে ধানে নিমের বীজের রস স্প্রে করা হয়েছিল। ধানের ফলন বিঘাপ্রতি ৬ বস্তা পাওয়া গিয়েছিল। এই ফসল বিসিকেভি-এর মাধ্যমে বস্তা পিছু ১৫০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছিল। এইভাবে চাষে সুফল পাওয়ার ফার্মার্স ক্লাবটির যৌথভাবে চাষের দিকে ঝোঁক তৈরি হয়েছে। এর পরে তাদের রাজ্য সরকারের এগ্রিমার্কেটিং দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এগ্রিমার্কেটিং এর মাধ্যমে তারা কিছু ধান থেকে চাল করে দিল্লির বঙ্গভবনের রাজ্য সরকারের স্টলে পাঠান। পরবর্তীতে এগ্রিমার্কেটিং বিভাগের তরফে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

ছবি : ইন্টারনেট

**লাভ ও ক্ষতির হিসেব নিকেশ**

| | |
|---|---|
| **চাষের খরচের হিসেব :**<br>১। জমি চাষ দেওয়া ২০০টাকা বিঘাx১০ বিঘা x৩ বার = ৬০০০ টাকা<br>২। সরিষার খইল ১১ টাকা কেজি প্রতি x ২০কেজি x১০ বিঘা = ২২০০ টাকা<br>৩। গোবর সার ৬ টন x ২ টাকা কেজি প্রতি =১২,০০০<br>৪। মই দেওয়া ১০০ টাকা বিঘা প্রতি x ১০ বিঘা =১০০০ টাকা<br>৫। বীজ (বিসিকেভি থেকে বিনামূল্যে পাওয়া গেছে)<br>৬। ধান তলা করার খরচ ৩ জন মজুর x ২০০ টাকা x ২দিন =১২০০ টাকা<br>৭। ধান রোয়া বিঘা প্রতি ৫০০ টাকা x ১০ বিঘা = ৫০০০ টাকা<br>৮। ঘাস নিড়ানি বিঘা প্রতি ৫০০ টাকা x ১০ বিঘা = ৫০০০ টাকা<br>৯। জৈব দ্রবণ ও কীটনাশক তৈরি করতে খরচ = ২০০ টাকা<br>১০। জৈব দ্রবণ ও কীটনাশক স্প্রে = দলের সদস্যরা করেছেন<br>১১। ধান কাটা ১০০০টাকা/বিঘা x ১০ বিঘা =১০,০০০ টাকা | |
| **মোট খরচ :** | ৪২,৬০০ টাকা |
| **বিক্রিত দ্রব্যের নাম,পরিমাণ, দর :**<br>১। ধান = ৬ বস্তা / বিঘা x ১০ বিঘা =৬০ বস্তা x১৫০০ টাকা =৯০,০০০ টাকা<br>২। খড় = ২ কাহন / বিঘা X ১০ বিঘা = ২০ কাহন X১০০০ টাকা /কাহন = ২০,০০০ টাকা | |
| **মোট বিক্রি :** | ১,১০,০০০ টাকা |
| **লাভ :** | ৬৭৪০০ টাকা |

## কৃষক রত্ন

এবছর রাজ্য সরকার প্রত্যেক ব্লক থেকে একজন করে অগ্রণী চাষিদের কৃষক রত্ন সম্মানে ভূষিত করেছে। এই সম্মান হিসেবে দেওয়া হয়েছে মানপত্র ও ৫ হাজার টাকা। নার্বাডের যে চাষিদলগুলি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যাণ্ড সার্ভিসেস সেন্টারের ট্রেনিং টিমের তদারকিতে জৈব চাষের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তাদের ৪ জনকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের আনন্দ মোহন মন্ডল এরকমই একজন চাষি। তিনি মল্লিকপুর গ্রামের মল্লিকপুর জৈব কৃষক সংঘের সদস্য। তিনি তাঁর জমিতে চাষের বিভিন্ন বিষয় একসাথে মিলিয়ে সমন্বিত চাষ করেছেন।

সম্মানিত হয়েছেন নিমাই চন্দ্র মন্ডলও। নদীয়ার হাঁসখালি ব্লকের গোপালপুর গ্রামের এই চাষি অ্যাসোসিয়েশন অব নদীয়া জেলা ফার্মার্স ক্লাব-এর একজন সংগঠক। কৃষি সম্প্রসারক হিসেবে তাঁর উদ্যোগে এই অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে।

সরবেড়িয়া জৈব কৃষক সংঘের চাষি বিশ্বজিৎ হালদার মথুরাপুর ১ নং ব্লকের কৃষক রত্ন হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি এসআরআই পদ্ধতিতে ধানের চাষে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ওই ব্লকে।

নদিয়ার হাঁসখালি ব্লকের আরেকজন চাষি শ্যামল কুমার বিশ্বাসও সম্মানিত হয়েছেন। তিনি জৈব উপায়ে কলা চাষ করে এলাকায় সাড়া পেয়েছেন। শ্যামলবাবু বোয়ালিয়া প্রভাতি ফামার্স ক্লাবের সদস্য। এঁদের সম্মান প্রাপ্তিতে আমরাও সম্মানিত হয়েছি।

## হিমসাগর আর ল্যাংড়ার গুণ নিয়ে আমদরবারে প্রভাববাবুর 'সুজাতা'

অংশুলা ঘোষ

আম জনতার দরবারে নতুন আম। উপহারটা দিলে এক 'আম আদমি'। হিমসাগর ও ল্যাংড়ার মিশ্রণে তৈরি সে আমের নাম 'সুজাতা'। ফলিয়েছেন নদিয়ার ফুলিয়ার কৃষক প্রভাতরঞ্জন দে।

প্রভাতবাবুকে কৃষিকাজে 'অভিযাত্রী' বলা চলে। প্রথাগত শিক্ষা প্রায় কিছুই নেই। তবুও না দমে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান তিনি। বাড়ির এক চিলতে উঠোনেই তার গবেষণাগার। প্রায় ২২ বছর ধরে 'সুজাতা'র জন্য 'ধাত্রীমাতার' ভূমিকা পালন করেছেন প্রভাতবাবু।

প্রভাতবাবু প্রথমে উঠোনের হিমসাগর ও ল্যাংড়া আমগাছের মুকুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটান। তৈরি হয় নতুন প্রজাতির আম। আশঙ্কা ছিল, সেই আম হয়তো স্বাদে গন্ধে খারাপ হবে। সাফল্যে যেন ' বোধি লাভ করেন প্রভাতবাবু। বোধি লাভের আগে বুদ্ধদেবকে পায়েস খাওয়ানো সুজাতার নাম অনুসারে আমের নাম দেন। তার পরেও চলে আরও ভাল করার চেষ্টা। ওই আমের বাছাই করা আঁটি থেকে ৭টি গাছ তৈরি করেন। বছর ছয়েক পরে সেই গাছগুলিতে ফল ধরে। সেই ফল স্বাদে-গন্ধে 'সুজাতা'র মতো।

এর পরেই শুরু হয়'সন্তানে'র স্বীকৃতি আদায়ের পালা। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানবিদ্যা বিভাগের গবেষকরা 'সুজাতা'কে পরীক্ষা করেন। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় সুজাতা'। কিন্তু আম দরবারে তখনও স্বীকৃতি মেলেনি। এক আধিকারিকের উদ্যোগে প্রভাতবাবু ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের 'প্রোটেকশন অফ প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিজ অ্যান্ড ফার্মার্স রাইটস অথরিটি'-র প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। 'সুজাতা'ই ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কৃষিমন্ত্রী শরদ পওয়ার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন তাঁকে। পুরস্কার পাওয়ার পর জনপ্রিয় হতে থাকে 'সুজাতা' নতুন আমের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আম বিশেষজ্ঞ সমরেন্দ্রনাথ খাঁড়া বলেন, 'হিমসাগরের মতো এর শাঁস বেশি। শাঁসের রং ল্যাংড়ার মতো। চামড়া হিমসাগরের মতো পাতলা। স্বাদে একটু মিশ্র ভাব'।

বিশেষজ্ঞ কী বলছেন? কৃষি দফতরের সহ-নির্দেশক (প্রশিক্ষণ) অনুপম পাল জানান, হিমসাগর ও ল্যাংড়া আমের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে কোনও সংকরায়ন হয় না। তবুও সফল হয়েছেন প্রভাতবাবু। সমরেন্দ্রবাবু বলছেন, 'প্রাকৃতিকভাবে অনেক গাছের পরাগ মেশার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে 'পিওর লাইন' মেনে চলায় সাফল্য এসেছে'। অনুপমবাবু বলেন,'বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা ভুলেই গিয়েছি, কৃষিতে আসল গবেষণাগার চাষের মাঠ। প্রভাতবাবু সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

**প্রভাতরঞ্জন দে ডিআরসিএসসি'র অর্গানিক ফার্মার্স ফোরামের সদস্য। এই খবরটি প্রকাশিত এবেলা পত্রিকায় ২৩.৭.১৩ তারিখে।**

# চাষি কমছে

দেশে চাষির সংখ্যা কমছে। লোক গণনা থেকে জানা যায় ২০০১-এর তুলনায় বর্তমানে চাষির সংখ্যা নব্বই লক্ষ কমে গেছে। যদিও কৃষক সম্প্রদায় এখনও মোট শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তবুও ২০০১-এর হিসাব ধরলে তাদের সংখ্যা সাত পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। কৃষকের সংখ্যা কমতে থাকাটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। গত পঞ্চাশ বছর ধরেই তাদের সংখ্যা কমছে অনেকটাই। দেশে বর্তমানে কৃষকের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি। কৃষকের সংখ্যা কমলেও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ কোটি। কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকের মধ্যে কৃষিতে যুক্ত রয়েছে আরো ছাব্বিশ কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ।

## তৃতীয় উদ্যোগ

মহারাষ্ট্র সরকার এক জৈব কৃষি নীতি বানিয়েছে। এই নীতিতে খামার থেকে ক্রেতা পুরো ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার ঠিক করেছে রাজ্যের মোট জমির ১০ শতাংশ জৈব চাষে লাগাবে, আর ২৫ শতাংশ জমি লাগাবে জৈব চাষের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায়। এই জন্য সরকার জৈব খাদ্যের মান বানাবে-সরকার জৈব খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ, মোড়ক তৈরি,গুদামজাতকরণ ও বাজার তৈরির ব্যবস্থা করবে। মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলে জৈবশস্যের চাহিদাবৃদ্ধিই এর কারণ। তবে পশ্চিমবঙ্গে এইভাবে তৈরি ফসলের চাহিদা থাকলেও এখনো অবধি কোনো জৈব কৃষি নীতি তৈরি হয়নি।

## মৎস্য পুরাণ

পরিসংখ্যান বলছে ভারতে প্রায় দু-কোটি মানুষের জীবন জীবিকা নদী, জলাশয়, পুকুর, জলাভূমিতে মৎস্যচাষের থেকে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা ও পুষ্টি জোগানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নদনদী ও অন্যান্য জলাশয়ের অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন হয়ে পড়ছে। কমছে মাছচাষ, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেশি প্রজাতির বহু মাছ। এই সেদিনও যারা ছিল গ্রামে গরিব গুর্বোদের সস্তা পুষ্টির অন্যতম উৎস।

## শারদ উপহার !

দেশজ উদ্ভিদ বৈচিত্র রক্ষার স্বীকৃতি। স্বীকৃতি কৃষি মন্ত্রকের। প্রাপক দেশের চার কৃষক দল আর ১০ কৃষক। দল প্রতি এজন্য প্রাপ্তি ১০ লাখ ও কৃষক প্রতি ১ লাখ টাকা। এই স্বীকৃতির পেছনে প্রোটেকশন অফ প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিজ অ্যান্ড ফার্মার্জ রাইট অথরিটি। চার কৃষকদলের ভেতর আছে মহারাষ্ট্র সিড সেভার ফার্মার্জ গ্রুপ, অন্ধ্রপ্রদেশের সঞ্জিবনী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। ডি পাওলি উইমেনস সেল্ফ হেল্প গ্রুপ, তামিলনাড়ু এবং কেরলের আকামপদাম চিম্পাচালন পুঞ্চাক্কাদু পদসেখর সমিতি। আর দশ কৃষকের ভেতর মনিপুর, রাজস্থান, কেরল, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশসহ বাংলার কৃষকও আছে। বাংলার কৃষকের নাম প্রভাতরঞ্জন দে বাড়ি পানপারা, নদীয়া।

## মহাত্মার দেশে

জিন বীজের আক্রমণ থেকে দেশী বীজ বাঁচাতে গুজরাটের পাঁচশোরও বেশি জৈব চাষি ব্যক্তিগত বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তাদের মতে, এর ফলে তাদের চাষের খরচ কমবে। অর্গানিক ফার্মিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সর্বদমন প্যাটেল-এর মতে, জৈব বীজ যে শুধু চাষের খরচ কমাবে তাই নয়, এ ক্ষেত্রে বাড়তি লাভ সুস্বাস্থ্য ও ফলন বৃদ্ধি।

## তোফা !

দেশে জৈব শস্য-সবজির চাহিদা বৃদ্ধি। বেশি বিক্রি সবজির। সবজি বিক্রির হার ৬৮ শতাংশ। তারপর আছে ফল, ফল বিক্রির হার ৫২ শতাংশ। তারপর জৈব ডাল ও দুধ। জৈব ডালের বিক্রি ৫১ শতাংশ আর দুধ ৪৫ শতাংশ। প্যাকেট খাবার, চা ও অন্য পানীয়ের ক্ষেত্রেও জৈব ফলনের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। এইসব বেরিয়ে এসেছে, অ্যাসোচ্যামের এক সমীক্ষায়।

## এগোচ্ছে...

ব্রহ্মপুত্র পারে জৈবচাষ। জায়গাটি আসামের বিহাগুর ও তার আশপাশ। এখানে চাষ জৈব শস্য-সবজির। বিহাগুরির জেলা সোনিতপুর, মহকুমা তেজপুর, বিহাগুরা ৫২ নং জাতীয় সড়কের ধারে। এখানে এই চাষ বেশ কয়বছর। এখানে ফলন রবিতে। ফলন আলু-বেগুন, টমেটো, কুমড়ো, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, রসুন, সরষে ও মসুরের। ■■

সম্পাদক : তাপস মণ্ডল, মিন্টু মল্লিক
সম্পাদনা : মিন্টু মল্লিক
হরফ ও রূপ: শিপ্রা দাস

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc.ind@gmail.com, www.drcsc.org